গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ পিরোজপুর

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
পিরোজপুর

প্রকাশকাল :
জানুয়ারী, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : পিরোজপুর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হলো জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এ বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এ বইটি লেখা হয়েছে পিরোজপুর জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ এবং মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এ বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এ বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এ বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এ বই সহায়তা করবে।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বা.প.ব্যু.) - এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে পিরোজপুরের উপর লিখিত বিভিন বই থেকে -

১। আহমেদ, সিরাজউদ্দীন, ১৯৮২। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল-ঢাকা। ঢাকা, জুলাই, ২০০৩।

২। পিরোজপুর জেলা তথ্য অফিস, ১৯৯৫। জেলা পরিক্রমা। জেলা তথ্য অফিস, পিরোজপুর। পিরোজপুর, এপ্রিল, ১৯৯৫।

৩। বিবিএস, ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬: জেলা সিরিজ পিরোজপুর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, নভেম্বর, ২০০১।

৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫। PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh, Dhaka, August 2001

৬। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৭। MD. HABIBUR RASHID, 1980. Bangladesh District Gajetteers Bakerganj, Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1980.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পিরোজপুর জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব জিয়াউল আহসান জিয়া, নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৪**
এক নজরে পিরোজপুর ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৪**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ৯
মৎস্য সম্পদ ১০
বনজ ও ফলজ সম্পদ ১১
পশু সম্পদ ১২
দুর্যোগ ১২
বিপদাপন্নতা ১৪

জীবন ও জীবিকা **১৫-১৭**
জনসংখ্যা ১৫
জনস্বাস্থ্য ১৫
শিক্ষা ১৬
সামাজিক উন্নয়ন ১৬
প্রধান জীবিকা দল ১৬
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৭
দারিদ্র্য ১৭

নারীদের অবস্থান **১৯-২০**
নারী-পুরুষ অনুপাত ১৯
বৈবাহিক অবস্থা ১৯
শ্রম বিভাজন ১৯
সক্রিয় শ্রমশক্তি ২০
স্বাস্থ্য পুষ্টি ২০
শিক্ষা ২০

অবকাঠামো **২১-২৩**
রাস্তা-ঘাট ও নদী পথ ২১
পোল্ডার/বাঁধ ২১
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ২১
হাট-বাজার ও বন্দর ২১
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ ২২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২২
হাসপাতাল ও ক্লিনিক ২২
হোটেল ও অবকাশ কেন্দ্র ২২
শিল্প ও বাণিজ্য ২২
সেচ ও গুদাম ২৩
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২৩
উন্নয়ন প্রকল্প ২৩

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৫-২৬**
পরিবেশগত সমস্যা ২৫
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৬
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ২৭

সম্ভাবনা ও সুযোগ **২৯-৩১**
কৃষি উন্নয়ন ২৯
শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩০
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার ৩১

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩৩**

দর্শনীয় স্থান **৩৫**

জেলা মানচিত্র

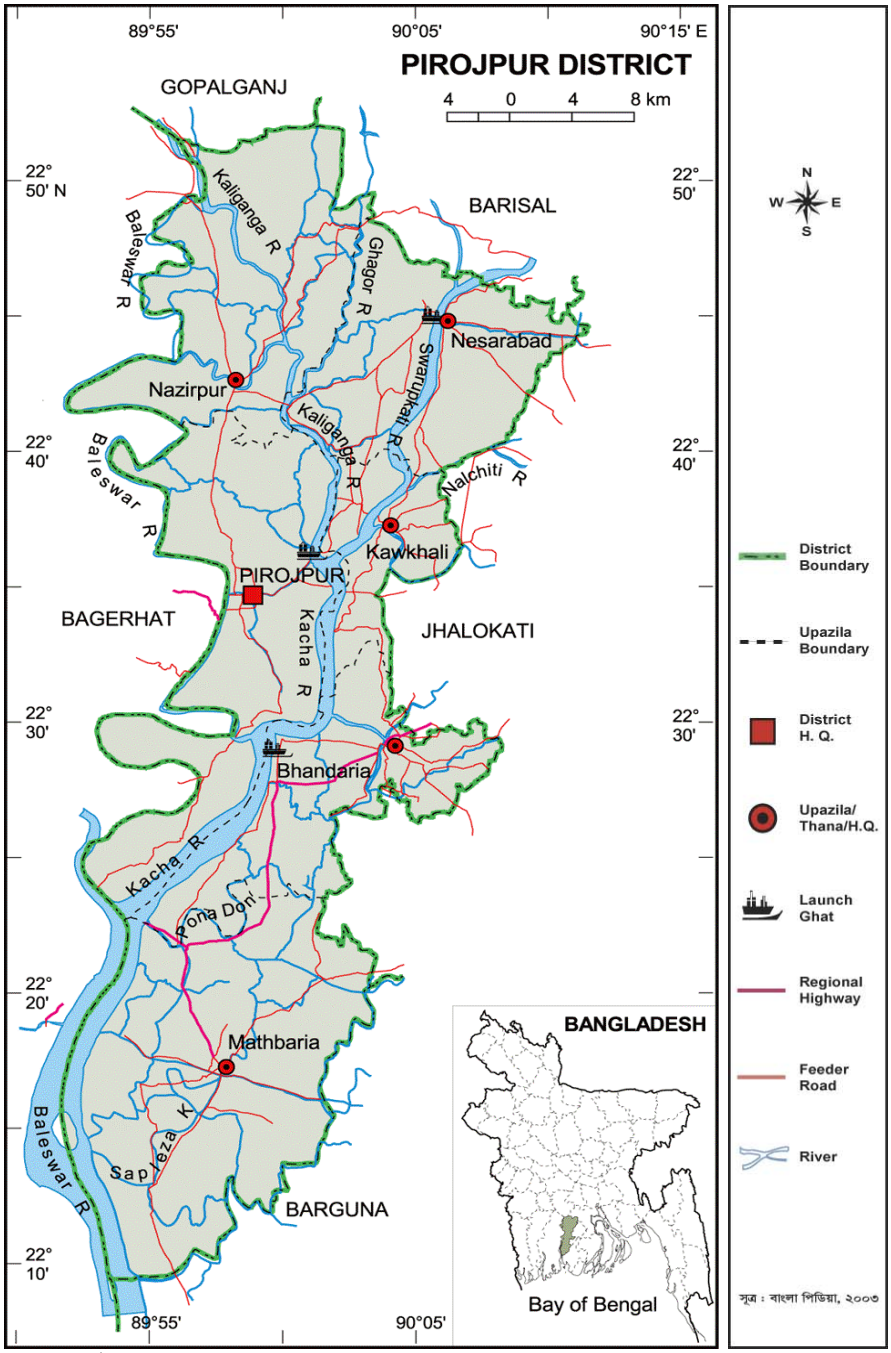

বি.দ্র.: নবগঠিত জিয়া নগর উপজেলার সীমানা মানচিত্রে চিহ্নিত নাই।

সূচনা

সুন্দরবনের কোলঘেঁষা প্রাকৃতিক সবুজের লীলাভূমি পিরোজপুর জেলা। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ আর গাছ-গাছালির সমারোহে অনন্য পিরোজপুরের বুক চিরে বয়ে চলেছে বেশ কয়েকটি নদী। বৈচিত্র্যে ভরপুর পিরোজপুর জেলার উত্তরে গোপালগঞ্জ, উত্তর-পূর্বে বরিশাল এবং পূর্বে ঝালকাঠী, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাগেরহাট এবং দক্ষিণ-পূর্বে বরগুনা জেলা অবস্থিত। জেলার একদিকে লবণ পানি অন্য দিকে মিঠা পানির অবস্থান।

১৯৫৯ সালের ২৮ অক্টোবর স্থাপিত পিরোজপুর মহকুমা ১৯৮৪ সালে জেলায় রূপান্তরিত হয়। পিরোজপুর নামকরণের একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। নাজিরপুর উপজেলার শাখারী কাঠির জনৈক হেলালউদ্দীন মোঘল নিজেকে মোঘল বংশের শেষ বংশধর হিসেবে দাবী করেছিলেন। তার মতে বাংলার সুবেদার শাহ্ সুজা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার নিকট পরাজিত হয়ে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে এসেছিলেন এবং আত্মগোপনের এক পর্যায় নলছিটি উপজেলার সুগন্ধ নদীর পারে একটি কেল্লা তৈরি করে কিছুকাল অবস্থান করেন। মীর জুমলার বাহিনী এখানেও হানা দেয় এবং শাহ্ সুজা তার দুই কন্যাসহ আরাকানে পালিয়ে যান। সেখানে আর এক রাজার চক্রান্তে নিহত হন। পালিয়ে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী ও এক শিশু পুত্রসহ থেকে যায়। পরবর্তীতে তারা অবস্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলে এসে বর্তমান পিরোজপুরের পার্শ্ববর্তী দামোদর নদীর মুখে আস্তানা তৈরি করেন। এ শিশুর নাম ছিল ফিরোজ এবং তার নাম অনুসারে নাম হয় ফিরোজপুর। কালে ভাষার পরিবর্তনে নাম হয়েছে পিরোজপুর।

জেলার মোট আয়তন ১৩০৮ বর্গ কি.মি. যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ১% । এটি উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ১৫তম এবং বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫০তম। ২০০১ সালে এ জেলার জনসংখ্যা ছিল ১,০৯৯,৭৮০।

জেলায় মোট ৭টি উপজেলা রয়েছে - পিরোজপুর সদর, মঠবাড়ীয়া, ভাণ্ডারিয়া, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, নাজিরপুর, জিয়ানগর (সদ্য প্রতিষ্ঠিত উপজেলা)। মঠবাড়ীয়া, স্বরূপকাঠী এবং পিরোজপুর জেলার তিনটি পৌরসভা। জেলায় ৫১টি ইউনিয়ন, ২৭টি ওয়ার্ড, ৪৫৪টি মৌজা ও ৬৪৭টি গ্রাম রয়েছে।

উপজেলা	৭টি
পৌরসভা	৩টি
ইউনিয়ন	৫১টি
ওয়ার্ড	২৭টি
মৌজা	৪৫৪টি
গ্রাম	৬৪৭টি

মাটি, ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-উপরিভাগের পানিতে কতটুকু লবণাক্ততা আছে, জোয়ার-ভাটার পরিমাণ এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কতটুকু তার উপর ভিত্তি করে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলাকে তীরবর্তী (Exposed coast) এবং ভাণ্ডারিয়া, কাউখালী, নাজিরপুর, স্বরূপকাঠী ও পিরোজপুর সদর উপজেলাকে অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior coast) এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে পিরোজপুর

	বিষয়	একক	পিরোজপুর	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১৩০৮	৪৭,২০১	১৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৭	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৫১	১৩৫১	৪৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	২৭	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৫৪	১৪৬৩৬	৬৭০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৪৭	১৭৬১৮	৮৭৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১১	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৫.৫৪	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৫.৪৬	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৮৪১	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০১	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৭	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৩	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১.১৪	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪২	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১০	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	১১	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	১.৩১	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৫৭	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,৭১৫	৬৭৮.৮০০	২,৩৭০.৭৪০	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৩,৬৩৮	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৯৯০	১৭,৪১৮	৫৩.৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৭	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩২	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৬	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২১	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৭	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬৩	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৪	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৬২	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬৮	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৭১	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৬৫	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৮২	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৪	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৮	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৫২২৩	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬৩	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৪	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৫	৬	৫	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	২	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৮	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৪.৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৬	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- সাক্ষরতা হার (৬৩%), যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫১%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৫৭ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় বেশি ।
- জেলায় রাস্তার ঘনত্ব (১.৩১ কি.মি./বর্গ কি.মি.) জাতীয় (০.৭২ কি.মি./বর্গ কি.মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় বেশি।
- জেলার ৪৮% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় বেশি।
- দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমানের ভিত্তিতে জেলায় দারিদ্র্য পীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৪৪%, ২১%), জাতীয় (৪৯%, ২৩%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার প্রায় ১০৬ কি. মি. নদী পথ রয়েছে।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- পিরোজপুর জেলায় মাথাপিছু আয় (১৩,৬৩৮ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৫৩.২%) জাতীয় হারের (৫২.৬%) তুলনায় বেশি কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫৩.৫%) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৪.৬%) জাতীয় (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে কম।
- জেলার মোট গৃহের ৮৪% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৮৮%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্প খাতের ভাগ (১৫%) জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) তুলনায় কম।
- জেলায় ১০% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- জেলায় ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা (৬৬%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৬৩) জাতীয় (প্রতি হাজারে ৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ৫,২২৩ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪,৬৩৭) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা (১৬%) জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	পিরোজপুর	উপজেলা			
				সদর	মঠবাড়ীয়া	ভান্ডারিয়া	কাউখালী
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১৩০৮	২৭৮	৩৫৩	১৬৪	৮০
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	৭৮	১৯	২০	৭	৫
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৫৪	১২৭	৮৪	৩৭	৪৫
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৪৭	১৪৯	৯৪	৪০	৫৯
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১১	২.২৩	২.৫৯	১.৫৮	০.৭৪
	পুরুষ	লাখ	৫.৫৪	১.১২	১.৩০	০.৮০	০.৩৮
	নারী	লাখ	৫.৪৬	১.১০	১.২৯	০৭৭	০.৩৬
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৮৪১	৮০১	৭৩৬	৯৬৬	৯৩১
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০:১০১	১০০:১০১	১০০:১০১	১০০:১০৪	১০০:১০৬
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৩	০.৪৫	০.৫৫	০.৩১	০.১৬
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৭	৪.৮৫	৪.৬৬	৪.৯৯	৪.৫১
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	১.১৪	২.৪	২.৫	২.৮	৩.২
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৬৬	৬২	৬৪	৭৫
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪২	৪৪	৩৬	৪৩	৫৫
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬	১২.১২	১.৮৫	৭.৬০	৬.২৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১২২৪	২৪৩	২৫৭	২০৯	৯৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৪৯	৩৯	৪৪	২৮	১৯
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৯	৬	৪	৫	৩
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩২	২৯	৩৩	২৫	৩২
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	১৮	৮৩	৮৩	৭৭	৮৩
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৮২	১৭	১৭	২৩	১৭
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৮৪০১৩	১৫৫৬২	২৪৪৯৭	১১০৯৪	৫৩৩৭
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩৬	৫৯	৫৭	৪২	৫৯
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫৭	৩০	৪১	৫২	৩৯
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৭	১১	২	৬	২
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৭৫০০	৭৪০০	৫০০০	৭৫০০	৭৫০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬৩	৬৪	৬৩	৬০	৬৫
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৭	৯৯	৯৫	৯৮	৯৪
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	১০০	৯৫	১০১	১০০
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৩৪৬৬	২৫৬০	২৪০৮	২৬২০	১২৭০
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৫৪	৬১	২৩	৫২	৭৫
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	১৫	১৪	১১	১৪	২০

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
স্বরূপকাঠী	জিয়ানগর	নাজিরপুর	
১৯৯	তথ্য নাই	২৭৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৯	তথ্য নাই	৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯২	তথ্য নাই	৬৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৩৪	তথ্য নাই	১৭১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.০৭	তথ্য নাই	১.৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.০২	তথ্য নাই	০.৮৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.০৫	তথ্য নাই	০.৮৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০৪৪	তথ্য নাই	৮০১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০০:৯৭	তথ্য নাই	১০০:১০২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৪৫	তথ্য নাই	০.৩৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৫৩	তথ্য নাই	৪.৭২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৪	তথ্য নাই	২.১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৬৫	তথ্য নাই	৪৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৫১	তথ্য নাই	৩১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৬.১১	তথ্য নাই	২.৮০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
২১৩	তথ্য নাই	২০৩	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৬৮	তথ্য নাই	৫১	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৭	তথ্য নাই	৪	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৫	তথ্য নাই	৩৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৮	তথ্য নাই	৮৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২২	তথ্য নাই	১৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১২১৪৯	তথ্য নাই	১৫৩৭১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
তথ্য নাই	তথ্য নাই	তথ্য নাই	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
তথ্য নাই	তথ্য নাই	তথ্য নাই	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
তথ্য নাই	তথ্য নাই	তথ্য নাই	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৭৪০০	তথ্য নাই	৫০০০	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৬৮	তথ্য নাই	৫৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৭	তথ্য নাই	১০০	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৯৭	তথ্য নাই	১০১	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
২৪৫৯	তথ্য নাই	২১৪৯	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
৫৫	তথ্য নাই	৮০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
২২	তথ্য নাই	৮	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

অসংখ্য নদী-খালে বিভক্ত ছোট আয়তনের পিরোজপুর জেলা পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। জোয়ার-ভাটার প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমির উর্বরতা যেমন অনেক বেশি, ঠিক তেমন অনুকূল আবহাওয়ায় অতি সহজে জন্মায় লতা-গুল্ম, ফুল-ফল, শস্য-বৃক্ষ। প্রকৃতির অপার উদারতায় পিরোজপুর সবুজের সমারোহে সুশোভিত। সমগ্র জেলাই যেন বৃক্ষচ্ছাদিত অরণ্য, মানুষের নিপুণ হাতে সাজিয়ে তোলা, যার প্রান্তরে প্রান্তরে শুধু সবুজের ছোঁয়া। সাগর পাড়ের সুন্দরবন পিরোজপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। নৈসর্গিক রূপের শোভা সর্বত্র। গাছ-পালা, বনজঙ্গলের সাথে জেলাবাসীর সম্পর্কও নিবিড়। বনাঞ্চল ও বৃক্ষরাজির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা প্রাচীন। এ অঞ্চল একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল, যার প্রমাণ এখনও লক্ষ্য করা যায়। ফসল আবাদের তাগিদে বন ধ্বংস করে মানুষ গড়ে তুলে ফসলের মাঠ। তবুও গ্রামীণ অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বনজ সম্পদ ও নার্সারী শিল্প। জেলাব্যাপী নার্সারীতে প্রতি মৌসুমে উৎপাদন করা হয় ফলজ, বনজ ও ঔষধী চারা। এর পাশাপাশি নাজিরপুর উপজেলার বিল অঞ্চলে এবং স্বরূপকাঠী উপজেলার কিছু অংশে ভাসমান পদ্ধতিতে উৎপাদিত সবজি এবং চারা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ পদ্ধতির চাষাবাদ এবং চারা উৎপাদন বিস্ময়কর এবং এ জেলার ঐতিহ্য।

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী-নালা, খাল-বিল, কৃষিজ, বনজ ও ফলজ সম্পদ, আবার সমুদ্র ও মোহনার নিকটতম অবস্থানের ফলে ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন-এর মত দুর্যোগ নিয়ে পিরোজপুর জেলার একটি নিজস্ব বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। এখানে কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে ভূমি ও পানি লবণাক্ততার উপর ভিত্তি করে।

পিরোজপুরের প্রকৃতি নদী নির্ভর। তবে সমুদ্র উপকূলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণে সমুদ্র মোহনা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন। সমুদ্রের মাছ, মিঠা পানির মাছ ও জীব বৈচিত্র্যে পিরোজপুরের রয়েছে স্বতন্ত্র অবস্থান। এ জেলার মানুষের সাগর-নদীর সাথে সম্পর্ক নিবিড়। জেলেরা মাছ ধরতে যায় সাগরে আর নদীতে। এরা ঋতু পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে স্বাদু পানি বা খাল-বিলে মাছ ধরে। জলোচ্ছ্বাস এ জেলায় চরম দুর্যোগ নিয়ে আসে। যেহেতু এ জেলা সমতল এবং মেঘনা-পদ্মার অববাহিকায় তাই বর্ষাকালে বন্যায়ও চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু : পিরোজপুর জেলার জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। এখানে আবহাওয়া বেশ গরম ও আর্দ্র। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪° সে. (বরিশাল তাপমাত্রা নির্ণয় স্টেশন) পর্যন্ত উঠে। এখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪৪% এবং ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৭৭% থাকে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১,৯১৮ মি.মি. (বি.বি.এস., ১৯৯৯)। বর্ষাকালে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার নদীগুলো উত্তাল হয়ে উঠে।

মাটি : পিরোজপুর জেলার মাটি মূলত দুই ধরনের, যেমন, (ক) পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় লবণবিহীন পলি-কাদা-মাটি ও (খ) জলোচ্ছ্বাসের ফলে মৃদু লবণাক্ত পলি-কাদা-মাটি। জেলায় মেঘনা-পদ্মার পলি-মাটি থাকার ফলে আম, কাঁঠাল, জাম, ইত্যাদি গাছপালা জন্মায় অনেক।

নদী ও মোহনা : বাংলাদেশের বড় নদীগুলোর বেশ কয়েকটির শাখা নদী পিরোজপুর জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এ জেলার নদী-নালার সংখ্যা অনেক; তবে কচা, সন্ধা, কালিগঙ্গা, বলেশ্বর, মধুমতি (অংশ বিশেষ) ও দামোদর অন্যতম। নদীগুলোতে সারা বছরই জোয়ার-ভাটা থাকে। পিরোজপুরে নদী আছে ১০৬ কি.মি. এবং ২০৫ কি.মি. ছোট-বড় খাল (বি.বি.এস)। জেলার মোট এলাকার ৮% নদী। এ জেলার যোগাযোগের প্রধান পথ নদী ও খাল। এ জেলার সাথে ঝালকাঠীকে সংযুক্ত করেছে "গাবখান চ্যানেল", যা বাংলার সূয়েজখাল নামে পরিচিত।

প্রধান নদী	**কচা, সন্ধা, কালীগঙ্গা, বলেশ্বর, মধুমতির অংশ বিশেষ**
নদীর দৈর্ঘ্য	**১০৬ কি. মি.**
উৎপত্তি স্থান	**পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ**

সুন্দরবন : এক সময় জেলার কিছু অংশ সুন্দরবন ছিল। তার কিছু কিছু প্রমাণ বর্তমানেও দেখা যায়। সুন্দরবনের অনেক জাতের গাছ এ জেলায় কোন কোন এলাকায় দেখা যায়। আবার সুন্দরবনে যে সকল ঝোঁপ-ঝাড় জন্মায় সেগুলো প্রায়ই জেলার নদীর বা খালের পাড়ে পতিত জমিতে জন্মাতে দেখা যায়। এ সকল গাছের মধ্যে গাব, হরতকী, কেওড়া, বৈরী, গোলপাতা, ভোয়লা, রঞ্জন ইত্যাদি।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য :

উদ্ভিদ : পিরোজপুর সুন্দরবনের কোলঘেঁষে অবস্থিত। এ এলাকায় গাঙ্গের পলল ভূমির উদ্ভিদ প্রচুর দেখা যায়। এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্রচুর পরিমাণ গাছ-পালা আছে।

কৃষি জমিতে বিভিন্ন জাতের শস্য যেমন স্থানীয় ও উচ্চফলনশীল জাতের ধান, পাট, দেশীয় রোপা ধান, শাক-সবজি, ডাল, তৈলবীজ, কলা, পান চাষ করা হয়। আবাদী জমির প্রায় ৮৬ ভাগেই ধান চাষ করা হয়।

বাড়িতে জন্মানো গাছের মধ্যে আম, গাব, জাম, তাল, তেঁতুল, কাঁঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বরই, পেয়ারা, লিচু, নারিকেল, সুপারি, কামরাঙ্গা, আতা, হরিতকী, আমলকি অন্যতম। এ ছাড়া অনেক লোকই কলা গাছ লাগিয়ে থাকে।

এ জেলায় উল্লেখযোগ্য গাছ-পালার মধ্যে রয়েছে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, রেইনট্রি, সাদা কড়াই, মেহগনি, আমড়া, গাব, কদম, তাল, নিম, হরতকী ও গোলপাতা ইত্যাদি।

স্থানীয় গাছের মধ্যে কড়ই, শাল কড়ই, রেইনট্রি, জারুল, শিমূল অন্যতম। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতের বিদেশী গাছ যেমন টিক, মেহগনি, শিশু রাস্তার পাশে ও বাড়িতে লাগানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মান্দার নামের এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ও কাউফলা (জিকা) গাছ বেড়া ও জ্বালানির জন্য লাগানো হয়। বর্তমানে ইউক্যালিপটাস ও পাইন গাছও লাগানো হচ্ছে।

এ জেলায় পাম জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে। জেলার সর্বত্র প্রচুর সুপারি ও নারিকেল গাছ এবং বিভিন্ন জাতের বেত, বাঁশ ও ছন জন্মে। জলা এলাকার শোলা ও শীতল পাটি দেখা যায়, যা বিভিন্ন প্রকার মাদুর ও ঝুড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী : অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বনের অভাবে এ জেলায় বড় বা মাঝারি ধরনের কোন মাংসাশী প্রাণী দেখা যায় না। তবে শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বাগডাস, উদবিড়াল, কাঠবিড়াল, বেজী, গুঁইসাপ, বিভিন্ন প্রকার ইঁদুর ও বাঁদুড় দেখা যায়। যদিও এদের অনেকগুলোই আস্তে আস্তে বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে।

সারা দেশের মতো এখানেও প্রায় সব ধরনের পাখিই দেখা যায়; যাদের মধ্যে শকুন, বাজ, গাংচিল, চিল, কানি বগা, গো বগা, কালা বগা, কাক ও মাছরাঙ্গা অন্যতম। পিরোজপুরে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আছে। এ ছাড়াও জলচর পাখী যেমন পানকৌড়ি, ডাহুক, কোরা, পিটালী, রাজহাঁস অন্যতম। এদের পাশাপাশি দোয়েল, কোকিল, হলদি পাখি, ফিঙ্গে, ময়না, শালিক, বুলবুল, টুনটুনি, শ্যামা, বাবুই, কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। শীতকালে এ জেলায় প্রচুর অতিথি পাখি আসে। যেমন হাঁস, সরাইল, সুমুক, ভাঙ্গা ইত্যাদি।

বছরের প্রায় সবসময়ই উপকূলীয় এলাকায় পাখি দেখা যায় এবং শীতের মৌসুমে অতিথি পাখিদের প্রচুর দেখা যায়। জেলার পাখিদের মধ্যে দেখা যায় দোয়েল, শালিক, গাংচিল, ঘুঘু, সবুজ ঘুঘু (বাঁশ ঘুঘু), ভাট শালিক, বালী হাঁস, কাঠ ঠোকরা, কোকিল, বক, মাছরাঙ্গা, ডাহুক, কবুতর, মাছরাঙ্গা, পানকৌরী ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছও এ জেলায় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় মাছগুলো হলো রুই, কাতল, মৃগেল, কালাবাউশ, আইড়, টেংরা, মাগুর, শিং, শোল, বোয়াল, গজার, পাবদা, কই, মুড়লা, পুটি, বাইন এবং চেলা। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা পুকুর ও দীঘিতে চাষ করা হয়।

সাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রূপালী ও সাদা রূপচান্দা, লইট্যা, ছুরি, তাপসি, পোয়া, সাদা দাতিনা, তুল্লার ডাণ্ডি, বাটা, ফানসা, গুইচ্চা, ভেটকি, লাল পোয়া, চাপাকড়ি ইত্যাদিসহ ৪৭৫ প্রজাতির মাছ বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়।

কৃষি সম্পদ

জেলার একটি বৃহৎ অংশই কৃষি আবাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। মোট জমির প্রায় ৮৬% জমিতে ধান চাষ হয় (সূত্র : পিরোজপুর সংকলন)। জেলায় তিন ধরনের ধান চাষ বেশি হয়ে যেমন দেশী রোপা আমন, উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান। এ ছাড়া বিল এলাকায় কিছু কিছু আউস ধানের চাষ হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অন্যান্য ফসল কিছু কিছু চাষ হয়, যেমন ডাল (মুশুরী, খেসারী, মুগ), হলুদ, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, পাট, আখ ও আলু।

ভাসমান কৃষি : বিল এলাকায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কারণ নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠী উপজেলার বিল এলাকায় বর্ষাকালে প্রচুর পানি হয়। এ সময় কৃষকরা শীতকালীন ফসল চাষাবাদের জন্য একধরনের ধাপ তৈরি করে। এ সকল ধাপ তৈরির উপকরণ হচ্ছে কচুরিপানা, ধানের (বোনা আমন) লম্বা নাড়া, নলখাগড়া, বিভিন্ন ধরনের পচনশীল জলজ উদ্ভিদ (টোপাপানা, খুদিপানা, কাঁটা শেওলা, এ্যাজোলা, কলমী লতা, উন্দুরকানী শেওলা, দুলালীলতা ইত্যাদি)। বর্ষাকালের শুরুতেই (আষাঢ়-শ্রাবণ) অর্থাৎ জুন-জুলাই মাস থেকেই কচুরিপানা সংগ্রহ করে ধাপ তৈরি শুরু হয় এবং শীতের শুরু পর্যন্ত এ ধাপ তৈরি করা হয়। স্থানীয় ভাষায় এর নাম "সরজান" পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বেশিরভাগ শীতকালীন সবজি চাষাবাদ হয় যেমন লাউ, শশা, কুমড়া, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি। এ পদ্ধতিটি আরও উন্নত করার জন্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

সমন্বিত চাষ : কৃষি নির্ভর এ জেলায় চাষাবাদের একটি বৈচিত্র্য হচ্ছে সমন্বিত চাষ। এ চাষের ধরন হচ্ছে কোন একখণ্ড জমির চতুরদিকে লম্বালম্বিভাবে পরিখা খনন করে, পরিখার মাটি দিয়ে জমির মাঝের অংশটা উঁচু করা হয়। যাতে স্বাভাবিক বন্যার পানিতে ডুবে না যায়। এ চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই জমিতে বছরে বিভিন্ন রকমের ফসল হয়ে থাকে। যেমন পেয়ারা, আখ, কচু, শীতকালীন সবজি, মরিচ ও মাছ ইত্যাদি। এ ধরনের তৈরি করা চাষযোগ্য জমিকে কান্দি বলা হয়।

পেয়ারা : পরিখার ভিতরের উঁচু করা জমির চারদিকে একটি নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে পেয়ারা গাছ লাগিয়ে দেয় এবং পেয়ারা গাছের ডালপালাগুলো পরিখার দিকে ঝুলে থাকে। এ পরিখা থেকে প্রতি বছর পেয়ারা গাছের গোড়ায় কাঁদা মাটি দেয়া হয়। বর্ষাকালে জেলায় প্রায় ১৫ হাজার মে. টন পেয়ারা জন্মায়, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাজারজাত করা হয় (সূত্র : পিরোজপুর সংকলন)।

আখ : পেয়ারা গাছের ভিতরের অংশে লাইন করে আখ চাষ করা হয় এবং এ আখগুলোকে পেয়ারা গাছ ঝড়/বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। এভাবে এ জেলায় বছরে ৪৮৫৬ হে. জমিতে প্রায় ১২ হাজার মে. টন আখ জন্মে। এ আখগুলো হচ্ছে ইশ্বরদী-১৮ ও তুরপীন জাতের।

সবজি চাষ : শীতকালে এ সকল জমিতে শাক-সবজি চাষ হয়। দুটি পেয়ারা গাছের মাঝে যেটুকু দূরত্ব রয়েছে সেখানে সীম গাছ লাগায়। ভাদ্র মাসে যখন আখ শেষ হয়ে যায় তখন ঐ জায়গায় আখের লাইনের মাঝে শীতের শাক-সবজি, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন ও মরিচের চাষ করে থাকে।

পেয়ারা ও আখ চাষ করার জন্য যে পরিখা খনন করা হয় সেই পরিখার মধ্যে কৃষকরা কার্তিক মাসে কচুর চারা লাগায়। খুবই সামান্য যত্নে এ সবজিটি বড় হয় এবং জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়ে বিক্রি করে। স্থানীয়ভাবে এ কচুকে নারকেলী কচু বলে।

মাছ : কৃষকরা কান্দি তৈরি করতে যে পরিখা খনন করা হয়,সে জায়গায় কচু তুলে নিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ডাল-পালা (কাঁটা) দিয়ে রাখে। ফলে এ সকল পরিখার মধ্যে বর্ষাকালে খাল-বিলের বিভিন্ন রকমের মাছ এসে জমা হয় এবং কার্তিকের শেষে এ পরিখার পানি চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফাগুন মাসে মাছ ধরা হয়। শিং, কই, মাগুর, শোল, গজার, পুটি, ট্যাংরা, মেনি, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়।

অর্থকরী ফসল : জেলায় অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে নারিকেল, সুপারি, কলা, পেয়ারা, আখ ইত্যাদি। উপকূলীয় এলাকাটির বেশিরভাগেই দেখা যায় নারিকেল, সুপারির বাগান। জেলায় আর একটি উল্লেখ করার মত ফসল হচ্ছে পান।

এক সময় দামোদর নদীর তীরে প্রচুর কলার চাষ হত। এখনও বহু কৃষক কলা চাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এ জেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় প্রচুর কলার চাষ হয়। জেলায় প্রায় ৩৪৯০ হে. জমিতে কলা চাষ হয়।

মৎস্য সম্পদ

সাগরের মাছ : পিরোজপুরে একদিকে যেমন প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়, অন্যদিকে সাগরের মাছও প্রচুর। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ইলিশ, ভেটকী, রিঠা, শিলন, পোয়া, তাপসী, ফাইসা, সামুদ্রিক চাপীলা, তুলার ডাটী, গুলশা ট্যাংরা, সামুদ্রিক বাটা ইত্যাদি। যেহেতু সমুদ্র মোহনার সংলগ্ন ফলে অনেক জেলেরা সমুদ্র থেকে ফিরে এ জেলার পারের হাট বন্দরে ট্রলার রাখে। পারের হাটে একটি বড় সামুদ্রিক মাছের বাজার এবং বেশ কিছু মাছের আড়ত রয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন জেলায় এবং পিরোজপুর জেলার হাট বাজারে মাছ সরবরাহ হয়। এখানে বেশ কয়েকটি বরফকল রয়েছে, যার ফলে মাছ সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করা সহজ হয়।

এক সময় কচা ও সন্ধা নদীর ইলিশ খুবই বিখ্যাত ছিল (মৎস্য অধিদপ্তর)। ইলিশ মাছ এ জেলার সব নদীতে পাওয়া যায়। মোহনায় (বিষখালী ও কচা) এবং সাগরের উপকূলে যেমনি পাওয়া যায় তেমনি মিঠা পানির নদীতেও (সন্ধা, কচা, কালীগঙ্গায়) বর্ষাকালে প্রচুর পাওয়া যায়। তবে এখন এ মাছের পরিমাণ দিন দিন কমছে। বিশেষ করে সন্ধা এবং কচা নদীর মাছ অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে।

মিঠা পানির মাছ : নদী, খাল-বিল, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। বেশি পাওয়া যায় রুই, কাতল, মৃগেল, সিং, কই, শোল, খলশে, মাগুর, ট্যাংড়া, পুটি, বোয়াল, আইর, বেলে, রয়না, সরপুটি, কালীবাউশ ও গজার ইত্যাদি। প্রচুর ছোট মাছও পাওয়া যায় এ জেলায়।

শুঁটকি : এ জেলায় কিছু কিছু সাগরের মাছ শুঁটকি করতে দেখা যায়। বিশেষ করে মঠবাড়ীয়া জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে। পিরোজপুর জেলার অনেক লোক শুঁটকি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। জেলায় যে সকল সমুদ্রের মাছ শুঁটকি করা হয় সেগুলো হচ্ছে লইট্যা, চাঁদা, বাগদা চিংড়ি, ফাইসা, ছোট চিংড়ি ইত্যাদি। যে সকল মিঠা পানির মাছ শুঁটকি করা হয় সেগুলো হচ্ছে তিন কাটা, পুটি, শোল, গজার, খলসে, রয়না, ইত্যাদি।

চিংড়ি চাষ : এ জেলার নাজিরপুর, পিরোজপুর সদর এবং মঠবাড়ীয়ায় উপজেলায় চিংড়ি চাষ হয়। জেলায় চিংড়ি ঘেরে দুই ধরনের চিংড়ি চাষ হয় যেমন গলদা ও বাগদা। এ সকল চিংড়ি চাষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হয়। নাজিরপুর ও পিরোজপুর সদরে গলদা এবং মঠবাড়ীয়া উপজেলায় বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। এ জেলায় ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের হিসাব মতে ২২৭৮ হেক্টরে ৫২৭ মে. টন এবং ২০০১-২০০২ সালে ২২৯৪ হেক্টরে ৫৮০ মে. টন চিংড়ি উৎপন্ন হয়েছে। বর্তমানে এ চাষের প্রসার ঘটছে। এ চাষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকারি ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

মাছ চাষ : জেলায় বর্তমানে প্রায় ৪০৮৫ হেক্টর পুকুরে বিভিন্ন রকমের মাছের চাষ হচ্ছে। পুকুর বা জলাশয়ের যেসব মাছের চাষ হয় তার মধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, মৃগেল, থাই পুটি, সিলভার কার্প, মৃনাল কার্প, গ্রাস কার্প, কালিবাউশ ইত্যাদি। মোট প্রায় ৭৭৭৪ মে. টন মাছ উৎপাদন হয়

বনজ ও ফলজ সম্পদ

এ জেলার দক্ষিণ ভাগ এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল, কালে কালে তা বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে এ জেলায় বিভিন্ন বনজ, ফলজ গাছ প্রচুর জন্মে, যা দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজ ঘন ছায়া ঘেরা কোন বনভূমি। জেলায় প্রায় ৯৮৯ হেক্টর জমিতে বনভূমি রয়েছে। জেলার নদীর পাড়ের গাছ-গাছালি সুন্দরবনের চরিত্র বহন করে। বিশেষ করে নলবন, ছৈলাবন, হোগলাবন ও কেওয়া কাটাবন ইত্যাদি। এ উদ্ভিদগুলো একসময় এ জেলায় নদীর দুইপাড়ে জন্মাত। নদীর পাড়ের এ সব বনে মাছ আশ্রয় নিত এবং খাদ্য সংগ্রহ করত আর পাখিরা রাতে আশ্রয় নিত। মানুষের জীবন যাত্রায় এগুলো খুবই উপকারী ছিল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও এসবের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। যেমন নদীভাঙ্গা রক্ষা, জলোচ্ছাস থেকে জমির ফসল রক্ষা ও সাইক্লোন থেকে আবাসভূমি/সম্পদ রক্ষা করত। বর্তমানে এ প্রাকৃতিক সম্পদগুলো প্রায় শেষ হবার পথে। এ ছাড়াও রয়েছে পতিত জমিতে, খালের পাড়ে ও নদীর পাড়ে বহু ঝোঁপ-ঝাড়, যা সুন্দরবনের অনেক প্রকৃতি বহন করে।

বনাঞ্চল	৯৮৯ হে.
মাছ চাষ	৪০৮৫ হে.
চিংড়ি চাষ	২২৯৪ হে.

জেলার মঠবাড়িয়ায় মাঝের চরে ম্যানগ্রোভ (প্যারাবন) বন ছাড়া সরকারি সৃজিত বাগান, অশ্রেণীভুক্ত বন, গ্রামীণ বন মিলিয়ে পিরোজপুরে বনাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক। জেলায় প্রচুর অর্থকরী বনজ ও ফলজ সম্পদ রয়েছে। বনজ সম্পদের মধ্যে মেহগনি, নিম, কড়াই, রেইনট্রি, পাহাড়ি কড়াই আর ফলজ সম্পদের মধ্যে আম, নারিকেল, সুপারি ও পেয়ারা উল্লেখযোগ্য।

নার্সারী : পিরোজপুর জেলায় গাছের চারা উৎপাদনে ব্যাপক বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগ রয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি নার্সারীতে উৎপাদিত হরেক রকম গাছের চারা স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছায়।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতি বছর যে পরিমাণ চারা প্রয়োজন তার ২০% শুধু পিরোজপুর জেলাই সরবরাহ করে। এ ২০ ভাগের ১০% চারা উৎপাদিত হয় শুধু নেছারাবাদ উপজেলায়। বাকি ১০% জেলার অন্যান্য উপজেলায় উৎপাদিত হয়। এ জেলার অনেক মানুষ নার্সারীকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে (সূত্রঃ পিরোজপুর সংকলন)। পিরোজপুরে বেশ আগে থেকেই চারা উৎপাদিত হয়ে আসছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। কোন কোন ব্যক্তিগত নার্সারীতে বছরে পাঁচ লক্ষাধিক চারা উৎপাদন হয়। ব্যক্তি উদ্যোগের সমন্বিত নার্সারী জাতীয় পরিচিতির বাইরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে সম্প্রতি। স্বরূপকাঠীর এক যুবক জাতিসংঘ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এ কাজে নারীরাও পিছিয়ে নেই। নিজেরাই তৈরি করেছেন ছোট-বড় নার্সারী। সহজ পদ্ধতির লাগসই প্রয়োগ ঘটিয়ে নার্সারী তৈরি করছেন। জেলার হাজার হাজার হেক্টর ভূমি এখন নার্সারীর আওতায়। বিশেষভাবে স্বরূপকাঠী, নাজিরপুর ও কাউখালী, মঠবাড়ীয়া উপজেলায় এ নার্সারী বেশি হয়ে থাকে। এসব নার্সারীতে বাংলাদেশের যে সকল গাছ আছে, প্রায় সব প্রকার এবং কিছু কিছু বিদেশী গাছের চারাও করা হয়।

পশু সম্পদ

জেলায় পশুসম্পদের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। বাংলাদেশের অন্য জেলাগুলোতে যে ভাবে পশু লালন-পালন করা হয় এখানেও একই রকম। জেলার বেশির ভাগ গৃহস্থ্যই হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ লালন-পালন করে থাকে। কৃষি শুমারি ১৯৯৬ অনুসারে লক্ষ্মীপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৮০৪৪২টি গৃহে গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪৯% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২৪৪৯৩৮। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে গড়ে ৩.০৪টি করে গবাদিপশু আছে।

দুর্যোগ

পিরোজপুর জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও পানি-মাটির লবণাক্ততা জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। এ ছাড়াও মানুষের অসচেতনতা, জ্ঞানের অভাবের কারণে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা হয়।

সাইক্লোন : সাইক্লোনের কারণে জেলার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলা একটি সাইক্লোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলে গণ্য করা হয়। আপদকালীন নিরাপত্তা, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব, অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়।

সাল	স্থান	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মি.)	ক্ষয়ক্ষতি (মৃতের সংখ্যা)
অক্টোবর ১৮৭৪	বৃহত্তর বরিশাল	৩-১০	১০০,০০০
মে ১৯৪১	বৃহত্তর বরিশাল	৪	৭,৫০০
নভেম্বর ১৯৭০	বৃহত্তর বরিশাল	৯	২৭৫,০০০
নভেম্বর ১৯৭৫	বৃহত্তর বরিশাল	৩.১	তথ্য নাই

জলোচ্ছ্বাস : এ জেলায় জলোচ্ছ্বাসে কৃষি সম্পদ, পশুসম্পদ, বনজ ও ফলজ বিভিন্ন রকমের অর্থকরী ফসলের ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবনহানি ঘটে। এ ধরনের ক্ষতি কৃষকরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। জলোচ্ছ্বাসের ফলে সাগরের লবণাক্ত পানি নদী, খালে-বিলে ও পুকুরে চলে আসে। ফলে পশুসম্পদ, ফলজ সম্পদ, কলা, পান ইত্যাদি ক্ষেত নষ্ট হয়।

ভরা জোয়ার : অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় ভরা জোয়ার দেখা দেয়। বর্ষাকালে স্বভাবতই দেশের উত্তরের নদীগুলোতে পানি বাড়ে এবং সমুদ্রে নামতে থাকে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। ফলে সমুদ্রের কোন রকম ঝড় বাতাস বইলেই নদীর পানি ৪/৫ ফুট বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের ক্ষেতে উঠে এবং বাড়ি-ঘর ডুবে যায়। এতে ফসল এবং ফলজ ও বনজ গাছপালার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে পানের বড়জ এবং আম, কাঁঠাল ও কলা গাছ নষ্ট হয়ে যায়।

বন্যা : পিরোজপুর সমতল জেলা এবং প্রচুর নদী-নালা ও খাল-বিল আছে। উল্লেখ্য, পদ্মা এবং মেঘনার অববাহিকায় এ জেলা অবস্থিত। অতিবৃষ্টি এবং উত্তরে ঢলের ফলে এ দুই নদীতে পানি বেড়ে যায় এবং এ সময় সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়ে, ফলে জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্যা জেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ বয়ে আনে এবং কৃষি ফসলসহ সকল কিছু নষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮-এর বন্যায় পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা ও স্বরূপকাঠী উপজেলার সকল ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে নদীর প্রবাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে সাগরের জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উত্তরে আসছে। ফলে কৃষি জমির মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীর মিঠা পানিও লবণাক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কৃষি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে, অন্যদিকে জেলায় খাবার পানিও লবণাক্ত হচ্ছে।

নদী ভাঙন : জেলায় নদী ভাঙ্গন একটি সমস্যা। এ জেলায় নদী ভাঙ্গনের ফলে বহু গ্রাম ও ব্যবসা কেন্দ্র বিলীন হয়ে গিয়েছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে যে সকল লোক বাড়ি হারায় তাদের পক্ষে একদিকে যেমন নতুন করে বসতবাড়ি বানান কঠিন, অন্যদিকে তারা ঐ সকল জায়গা-জমি কখনোই আর চর আকারে ফিরে পায় না। নদী ভাঙনের ফলে এখানকার জনগণ তাদের বহুদিনের পুরানো বসতবাড়ি ও পুরানো অর্থকরী গাছ-পালা হারায়। জেলায় বেশ কয়েকটি নদীর মোহনা রয়েছে যেমন হুলার হাট ও কচা-বিষখালী নদীর মোহনা। এ দুটি মোহনাই প্রচুর ভাঙ্গে।

বন উজার : জেলার একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারনে সেই বন এবং অন্যান্য গাছপালা দিন দিন উজার হওয়ার ফলে দুর্যোগ বাড়ছে। যেমন নদী ভাঙ্গন, নদীর লবণাক্ত পানি খালে বিলে উঠছে এবং ফসলী জমির উর্বরতা হারাচ্ছে, কমে যাচ্ছে মাছ ও পশুপাখী ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণ : জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে গড়ে উঠছে ছোট ছোট শিল্প-কারখানা। মানুষের অসচেতনতা ও অজ্ঞতার ফলে জেলার তিনটি পৌরসভা, ৪/৫টি ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থের বেশির ভাগই নদীতে ফেলা হচ্ছে। ফলে দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। অন্যদিকে জমিতে রাসায়নিক সার, চিংড়ি ঘেরে রাসায়নিক সার, বিভিন্ন রকমের ঔষধপত্র ব্যবহার করায় মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। ফলে এলাকার জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্য কমছে এবং কৃষি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে।

নদী ভরাট : জেলার নদীগুলো খুব দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে উজানে নদীর প্রবাহ কমে যাওয়া। বিশেষ করে পদ্মা প্রবাহ কমে যাবার ফলে ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের বন্যায় প্রচুর উত্তরের বালু এসে নদীর তলদেশ ভরাট হয়েছে। একদিকে নদীর গভীরতা কমে জোয়ারের লবণাক্ত পানি উপরে চলে আসতে শুরু করছে, অন্যদিকে গ্রামের খাল-বিলগুলো ভরে যাচ্ছে। ফলে নৌ-চলাচল, জমিতে সেচ দেয়া এবং চাষাবাদ করা কঠিন হচ্ছে।

আর্সেনিক : জেলার সবক'টি উপজেলায় আর্সেনিক একটি প্রকট সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছে। প্রতি লিটার পানিতে ৩০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক রয়েছে। জেলায় শিশুরাই আর্সেনিকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। আর্সেনিকের প্রভাবের ফলে শিশুদের বিভিন্ন রকমের চর্ম রোগ ও পেটের পীড়া দেখা দিচ্ছে। এমনকি ধীরে ধীরে অনেকের শরীরে ক্যানসার দেখা দিচ্ছে।

বিপদাপন্নতা

সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব ইত্যাদি প্রধান কয়টি জীবিকা দলের আর্থ-সামাজিক বিদাপন্নতার কারণ। জেলেদের দৈন্যদশার কারণ হলো দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা ইত্যাদি। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে তাদের কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃ সুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিন মজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

পিরোজপুর জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৫.৫৪ লাখ এবং নারী ৫.৪৬ লাখ। মোট জনসংখ্যার ৮৪% গ্রামে এবং ১৬% শহরে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কি.মি. ৮৪১ জন লোক বাস করে (বি.বি.এস, ২০০৩) ।

মোট জনসংখ্যা	১১ লাখ
পুরুষ	৫.৫৪ লাখ
নারী	৫.৪৬ লাখ
মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	২.৩৩ লাখ
শহুরে	০.৩৭ লাখ
গ্রামীণ	১.৯৬ লাখ
গ্রামীণ জনসংখ্যা	৯.২৪ লাখ
পুরুষ	৪.৬৪ লাখ
নারী	৪.৬১ লাখ
শহুরে জনসংখ্যা	১.৭৫ লাখ
পুরুষ	০.৯০ লাখ
নারী	০.৮৫ লাখ
জনসংখার ঘনত্ব	৮৪১
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৪.৭
নারী প্রধান গৃহ	১.১৪%
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬৩

জেলায় ০-১৪ ও ৬০+ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৮৭।

ঘর-গৃহস্থালি : জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (৩৬,৬৬০) ও গ্রামীণ (১৯৬,৫০০) মিলিয়ে পিরোজপুরে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ২৩৩,১৬০টি। পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৪.৭ জন ।

১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, পিরোজপুর জেলার মোট ঘরের ৫৮% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৪১% ঘর ঢেউটিন বা টালীর তৈরি এবং ১% সিমেন্টের ছাদ। আবার এ সব ঘরের মধ্যে ৩৮% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের ও ৫% মাটি ও দেশীয় ইটের এবং ৮% বেড়া টিনের, ৪৭% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ২% ঘরের দেয়াল পাকা।

ঘরের ছাদ	%
ছন, বাঁশ,পাটকাঠী, পলিথিন	৫৮
ঢেউটিন বা টালী	৪১
সিমেন্টের ছাদ	১
ঘরের দেয়াল	
পাটকাঠী, বাঁশের তৈরী	৩৮
মাটি ও দেশীয় ইটের	৫
টিনের	৮
কাঠের	৪৭
পাকা দেয়াল	২

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নেই। এ জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৩ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৪ (বি.বি.এস- ইউনিসেফ, ২০০১)। জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫% শিশুই চরম অপুষ্টির শিকার। এ পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৮২%, ৮৩%, ৯৩% শিশু। এ ছাড়া ২১% ORT নিয়েছে। পিরোজপুর জেলার ৭৯% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা হলো সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১) ।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার ৪৮% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৪৭% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে এবং ৫% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধা বিশ্লেষনে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। শহরে ৮৬% পাকা, ৯% কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে, অন্যদিকে গ্রাম এলাকায় ৪৩% পাকা ও ৫২% কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৮৪% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী ১৬% অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা

জেলার সাক্ষরতার হার (৭^{+}) ৬৩% (বি.বি.এস.- ২০০২)। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের সাক্ষরতার হার ৬৮%। এর মধ্যে পুরুষ ৭১% এবং নারী ৬৫% (বি.বি.এস, ২০০৩)।

সামাজিক উন্নয়ন

পিরোজপুর জেলা (৭^{+} বছর) সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিকভাবে এগিয়ে রয়েছে। তবুও সামগ্রীকভাবে উন্নয়নে এগুতে পারেনি।

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর)	৬৩%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৮৪%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৪৮%
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	৫২২৩ জন

প্রধান জীবিকা দল

কৃষিনির্ভর এ জেলার প্রধান ফসল ধান। গ্রামীণ মোট জনসংখ্যার ৮১% কৃষিজীবী (সূত্র : পিরোজপুর সংকলন)। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন, নদীভাঙ্গন, লবণাক্ততা, বন্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমি ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ এবং শ্রম বিক্রির জন্য বিভিন্ন শহরে বা বন্দরে যাচ্ছে।

জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক, কাঠকাটা শ্রমিক (বাওয়ালী) ও মধু সংগ্রহ শ্রমিক (মৌয়ালী)। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায়। যেমন শাক-সবজি, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি। এ ছাড়া জেলায় জেলে ও শুঁটকি শ্রমিক রয়েছে।

কৃষক : পিরোজপুর জেলায় মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১৪২,৪৫৮ (৬৫.৮%), মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) ২৯৮৭৪টি (১৩.৮%) পরিবার এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৩৪৯৮টি (১.৬%)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৬৯৩৪৮টি।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত পিরোজপুর শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভীড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন, অন্যদিকে শিক্ষার হার বেশি থাকার ফলে শহরে গিয়ে এরা গার্মেন্টস শিল্পে ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

জেলে : জেলায় জেলেদের সংখ্যাও অনেক। এরা সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে থাকে। গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। এরা বছরের মে মাস থেকে

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার অভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খালে সারা বছর মাছ ধরে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সমুদ্রগামী এবং অভ্যন্তরীণ বড় নদীতে জেলেদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবননাশ - এ সব জেলেদের জীবনে প্রায়ই ঘটছে। দাদন বা মহাজনী শোষণতো রয়েছেই। জেলার গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ১৬% পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রীক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পিরোজপুরে সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৯৯০ হাজার। এর মধ্যে ৫৯% পুরুষ এবং ৪১% নারী। ১৯৯৫-৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৭২১ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৬০%, ৪০% (বি.বি.এস, ২০০০)। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৩,৬৩৮ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর।

মাথাপিছু আয়	১৩৬৩৮ টাকা
মোট শিল্পে আয়	১৫%
বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৪.৬%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	১২.৫%

দারিদ্র্য

এ জেলায় বেশিরভাগ লোক কৃষিনির্ভর। জেলার সব ধরনের কৃষি প্রকৃতি নির্ভর, তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এসব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পরে যায় দুরবস্থায়। আর এ ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্য সীমার মধ্যে চলে যায়।

দরিদ্র	৪৩.৫%
অতি দরিদ্র	২১.৪%
ভূমিহীন	৫৩.২%
ক্ষুদ্র কৃষক	৬৫.৮%

পিরোজপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৩.৫% দরিদ্র এবং ২১.৪% অতিদরিদ্র (বি.বি.এস/ইউনিসেফ)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৩.২% ভূমিহীন এবং ৬৫.৮% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস.- ১৯৯৬)।

নারীদের অবস্থান

বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চাকরি, ঋণ সুবিধা থেকে শুরু করে সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব - সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। তবে এ বৈষম্য বা অধ:স্তনতার চিত্র দেশের সব জায়গায় একইরকম নয়। স্থানীয় পরিবেশ, দারিদ্র্য, শিথিল পারিবারিক বন্ধন সমাজের দরিদ্রতম নারীদের অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন বয়ে আনছে। আর তাই, নারীদের অবস্থানকে আজ আর তথাকথিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেখার অবকাশ নেই। অতি সম্প্রতি, সিপিডি-ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় পিরোজপুর জেলা "মধ্যম মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য - এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নারী-পুরুষ অনুপাত

পিরোজপুরের মোট জনসংখ্যার ৪৯.৬৬% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৭। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯২। জেলার নারীদের প্রজনন হার ২। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে প্রায় ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৩ জন। জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মুত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

- **জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০১**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৯৪) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ৯০) তুলনায় অনেক বেশি।**
- **জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৬৩) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ৪৩) তুলনায় অনেক বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার জাতীয় হারের সমান।**
- **নারীদের মধ্যে সার্বিক (৭^{+}) ও প্রাপ্ত বয়স্ক (১৫^{+}) সাক্ষরতার হার ৬২% এবং ৬৫%, যা জাতীয় (৪১%) হারের তুলনায় অনেক বেশি।**
- **জেলায় সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ (৪১%) জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে বেশি।**
- **মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার জাতীয় হারের তুলনায় বেশি।**

বৈবাহিক অবস্থা

৩১.৫৮% নারী বিবাহিত এবং ৪.২১% নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস.- ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮০.৬% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব হারিয়ে পিরোজপুরের নারীরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে।

শ্রম বিভাজন

নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এ জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সক্রিয় শ্রমশক্তি

পিরোজপুরের নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ বাড়ছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৪০% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪১% (বি.বি.এস.- ২০০১)। উল্লেখ্য, এই ৪১% নারীরা গ্রামীণ নারীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা শ্রমশক্তি সমীক্ষা (২০০২) অনুসারে, পিরোজপুর জেলার শহরাঞ্চলে সক্রিয় শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ অনুপস্থিত। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, চিরায়ত অধ:স্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি

পিরোজপুরের নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো, সেবা ব্যবস্থা, নারীর স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৮%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৪.৮% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৮৫.৫% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন, মাত্র ৬.৪% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান আর আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৪.১% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা

পিরোজপুরের নারীদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। কেননা ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২%, যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হারের (৬৫%) প্রায় সমান সমান। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিরোজপুরের মেয়েরা এগিয়ে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৮% এবং মোট ছাত্রছাত্রীদের (যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে) ৪৯% ছাত্রী। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রী ৪৯.৫৭% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রী ৪৮% ছাত্রী। জেলার কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪৮.৫৮% ছাত্রী। (ব্যানবেইস, ২০০৩)

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট ও নদীপথ

পিরোজপুর জেলায় ১৭১১ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ২০ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ৪৭৭ কি.মি. ফিডার রোড এ, ৮০ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৪১৬ কি.মি. গ্রামীণ ১, ও ৭১৮ কি.মি. গ্রামীণ ২ ধরনের রাস্তা রয়েছে।

এ জেলায় ১০৬ কি.মি. নদী রয়েছে এবং ২০৫ কি.মি. খাল যেখানে জোয়ার-ভাটার পানি আসে এবং নৌকা চলাচল করে, যা একদিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা আবার পরিবহন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খুবই জরুরী। নদী পথে পরিবহন খরচ কম হলেও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা কঠিন হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাটেরও উন্নয়ন প্রয়োজন।

পোল্ডার/বাঁধ

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভরা জোয়ারের মত বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে বাংলাদেশে পোল্ডার বা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি পোল্ডার রয়েছে। এই পোল্ডারে (৩৯/১সি) ৩৮ কি.মি. বাঁধ, ৬টি রেগুলেটর, ৮টি ফ্লাসিং ইনলেট, ৪০টি নিষ্কাশন খাল রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০০০ হে. ভূমি রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮০০ হে. চাষাবাদ যোগ্য জমি রয়েছে। জেলার নাজিরপুর উপজেলায় সমুদ্রের লবণাক্ততা থেকে নিচু এলাকার জমি রক্ষার জন্য একটি প্রকল্প রয়েছে। এ সকল বাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করা প্রয়োজন কিন্তু এর কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব এবং বাঁধ দুর্বল হওয়ার ফলে অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে বিপর্যয়ের সময় লোনাপানি প্রবেশ করে ফসলহানিসহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৪২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে (এলজিইডি ২০০৪)। এ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে মোট ৮৭,৯৮২ জন লোক আশ্রয় নিতে পারে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮% লোক আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা দেয় এবং অন্য সময়ে খাদ্যগুদাম এবং স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর

বিদ্যুৎ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	২৩২০০
শহরে	৮৯০০
গ্রামে	১৪৩০০
টেলিফোনের সংখ্যা	১৮৩৩

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা এবং ভোগ্যপণ্য বিস্তারের কারণে জেলায় হাট-বাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জেলায় ১৪৭টি হাট- বাজার রয়েছে। জেলার বেশির ভাগ পণ্য নৌপথে চলাচল করে এবং নিম্ন আয়ের লোকেরা চলাচল করে নৌপথে। আবার অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথ ছাড়া উপায়ও থাকে না। তাই বেশিরভাগ লোক নৌপথ ব্যবহার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য জেলায় মোট ৮টি নদী বন্দর গড়ে উঠেছে। এ বন্দরগুলোতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করা স্টিমার, বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে। এ বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাট-বাজার ও মোকাম। এ সকল বন্দরের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়লে জেলা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ জেলায় তিনটি বাস স্টেশন রয়েছে এবং প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ২৩,২০০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এর মধ্যে ৮৯০০টি পরিবার শহরে এবং গ্রামে ১৪,৩০০টি পরিবার। এ জেলায় মোট ৭টি উপজেলা রয়েছে, প্রত্যেকটির সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা রয়েছে। এ জেলায় সবক'টি উপজেলা, বন্দর ও জেলা শহর মিলে প্রায় ১৮৩৩টি ডিজিটাল টেলিফোন রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর তথ্য অনুযায়ী জেলায় প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ১২২৪টি। এর মধ্যে সরকারি ৬০৬টি এবং বাকী বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ৪৭১৪৮ জন এবং বেসরকারি স্কুলে ৬২,৫৯০ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ৪১টি স্কুল রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮৬৬১ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪৩১ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ২০৮টি। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭১,২৪৫ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩৪৯২ জন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ২৯টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১,৭১৯ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাক্রমে ৬১৭ জন।

এ ছাড়া পিরোজপুর জেলায় ১৫৫টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে শরশিনার মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। এ সকল মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৪,৮২০ জন; এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১২,৮৮০ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১১,৯৪০ জন। এ ছাড়াও জেলায় একটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ কেন্দ্র (পিটিআই), একটি পশু চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরি স্কুল ২টি ও ১টি টেক্সটাইল স্কুল রয়েছে। (বি.বি.এস.-এমআইএস সেকশন ২০০৩)

হাসপাতাল ও ক্লিনিক

১টি আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে। এ ছাড়া ৫টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১টি টিবি ক্লিনিক, ২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৩৫টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৪১৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ১টি ডায়েবেটিক হাসপাতাল রয়েছে (পিরোজপুর পরিচিতি)। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি বেসরকারি ক্লিনিক ও একটি বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে। জেলায় ৫২২৩ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে।

হোটেল ও অবকাশ কেন্দ্র

জেলায় সার্কিট হাউস রয়েছে, একটি ডাক বাংলো ও ২টি হোটেল রয়েছে। এ ছাড়াও উপজেলাগুলোতে ১টি করে ডাকবাংলো রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

এ জেলায় প্রচুর নদী-নালা ও খাল-বিল থাকায় কোন সময়ই শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি বা উঠার তেমন সুযোগও ছিল না। বর্তমানে এ জেলায় সমুদ্রের মাছ বা মিঠা পানির মাছ বরফজাত করার জন্য বরফ দরকার হয়। ফলে বর্তমানে বেশ কিছু বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া প্রচুর ধান ভাঙ্গার কল রয়েছে। স্বরূপকাঠিতে গড়ে উঠেছে প্রচুর স-মিল এবং কাঠের আড়ত। এখান থেকে কাঠ চেরাই করে দেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠান হয়। এ ছাড়া স্বরূপকাঠি উপজেলায় ১টি বিসিক শিল্পনগরী রয়েছে এবং জেলা সদরের কাছে জুজখোলায় একটি টেক্সটাইল মিল নির্মাণ করা হচ্ছে।

সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এলএলপি দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং

খাদ্য গুদাম	৩২টি
বীজ গুদাম	১টি
সার গুদাম	৩টি

পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এ জেলায় ৬৮৯টি এলএলপি দিয়ে ৯৪৩২ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ৩২টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। এই গুদামগুলোর ধারণক্ষমতা ১৬২৫০ মে. টন। ১টি বীজ গুদাম রয়েছে, যার ধারণক্ষমতা ২০০ মে. টন, ৩টি (১২০০ মে. টন) সারের গুদাম রয়েছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

পিরোজপুরে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১১১টি সমবায় সমিতি, ৩৪৫টি ক্লাব, ১০১টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪৫টি মসজিদ, ১২২১টি মন্দির, ১৫টি খ্রিষ্টান উপাসনালয়। এ ছাড়া ২৮টি কমিউনিটি সেন্টার, ১২৩টি পোস্ট অফিস, ৫৭টি ব্যাংক শাখা রয়েছে। পিরোজপুর জেলায় ১০৭টি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে পিরোজপুর জেলায় সরকারি মোট ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। এ প্রকল্পগুলো বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড	২
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলায় বেসরকারি সংস্থাগুলোও কাজ করছে। যেমন কারিতাস, রিসোর্স ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, ইন্টিগ্রেটেড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট, সিসিডিবি, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কেয়ার-বাংলাদেশ। এ ছাড়াও স্থানীয় কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। যেমন ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার, সকলের জন্য, পার্ট, রিক, উদ্দীপন, পিডিএফ, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, পল্লী পুনর্গঠন ক্লাব, ডাক দিয়ে যাই, অন্বেষা ফাউন্ডেশন, সুন্দরবন বহুমুখী গ্রামীণ ফাউন্ডেশন, রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ভূমিহীন উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্র পিরোজপুর ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান জাতীয় এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ২২% গৃহস্থ। ৬৭১২ টাকা হারে ৩৪.৫৭ কোটি টাকার মোট ৫১৫০৮টি ঋণ প্রদান করা হয়েছে, গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৬৭১২ টাকা (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দুঃস্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

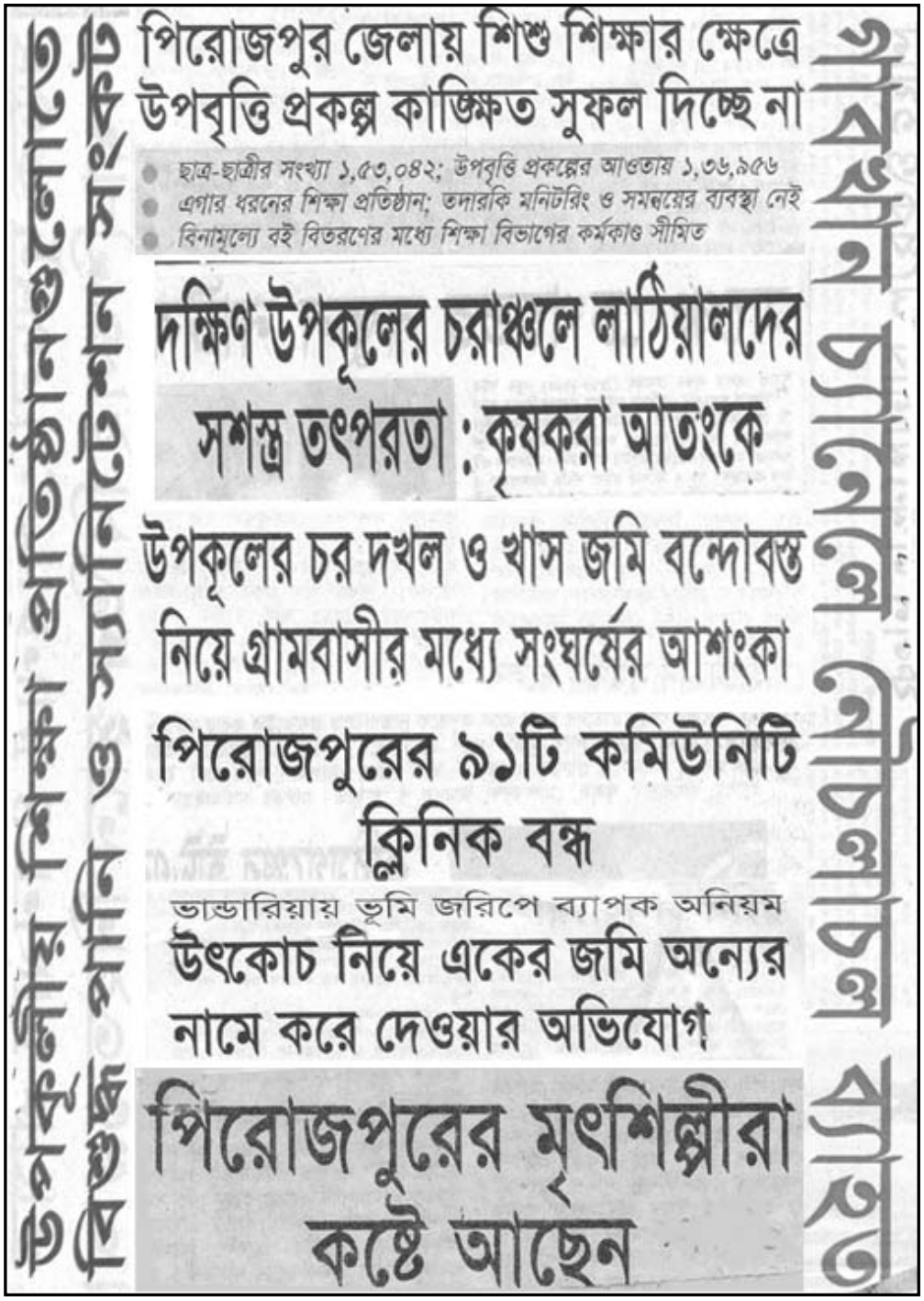

পিরোজপুর জেলায় শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রকল্প কাঙ্ক্ষিত সুফল দিচ্ছে না

- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১,৫৩,০৪২; উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ১,৩৬,৯৫৬
- এগার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; তদারকি মনিটরিং ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই
- বিনামূল্যে বই বিতরণের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ড সীমিত

দক্ষিণ উপকূলের চরাঞ্চলে লাঠিয়ালদের সশস্ত্র তৎপরতা : কৃষকরা আতংকে

উপকূলের চর দখল ও খাস জমি বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা

পিরোজপুরের ৯১টি কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ

ভান্ডারিয়ায় ভূমি জরিপে ব্যাপক অনিয়ম

উৎকোচ নিয়ে একের জমি অন্যের নামে করে দেওয়ার অভিযোগ

পিরোজপুরের মৃৎশিল্পীরা কষ্টে আছেন

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

পিরোজপুর জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক, নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যা
- সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস
- বন্যা
- জলাবদ্ধতা
- জলবায়ুর পরিবর্তন
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- পরিবেশ দূষণ
- ভরা জোয়ার

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কুটির শিল্পের সমস্যা
- ফলজ কৃষির সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা
- উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : নদী প্রবাহ কমে যাওয়া, নদীর ভাঙন, নদীর তলদেশ ভরাট এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানি নদীর অনেক উজানে প্রবেশ করেছে। ফলে জমিতেও লোনাপানি প্রবেশ করছে এবং জমি লবণাক্ত হচ্ছে।

বন্যা : বন্যা জেলার একটি বৃহদাংশ এলাকার ক্ষতিসাধন করে। বিশেষ করে বর্ষার সময় জেলার উত্তরের বন্যার ফলে খাল-বিল, বাড়ি-ঘর ডুবে যায় এবং জেলার প্রধান আয়ের উৎস কৃষিজাত ফসল নষ্ট হয়।

জলাবদ্ধতা : এ জেলায় গ্রাম-গঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পরে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বড় জোয়ারে পানি উঠলে আর নামতে পারে না। আবার অতি বৃষ্টি হলেও জমিতে পানি জমে যায়, ফলে ফসলের ক্ষতি করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত রাস্তাঘাটও জলাবদ্ধতার একটি কারণ।

ভরা জোয়ার : বর্ষা মৌসুমে অমাবস্যা-পূর্ণিমা'য় সমুদ্র উত্তাল হলে ভরা জোয়ার দেখা যায়। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে চর ও ফসলের জমিতে ৩-৪ ফুট পানি হয়। এর ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়।

পরিবেশ দূষণ : জেলার শিল্প কারখানা ও শহরের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশকে বেশ দূষিত করছে। জেলা শহরের নদীর তীরে অবস্থিত বিভিন্ন কারখানা প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এবং সৃষ্ট বর্জ্য স্থানীয় নদীতে ফেলা হয়।

একই সাথে শহরের বর্জ্য পদার্থও নদীর পানিতে মিশে যাচ্ছে। ফলে নদীর পানি এবং স্থানীয় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই পানি যেমন মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে একই সাথে ফসলের জমি এবং ফসলেরও ক্ষতি করছে।
এছাড়াও চিংড়ি ঘের, জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার জেলার সার্বিক পরিবেশকে দূষিত করছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : পিরোজপুর জেলায় এক সময় প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যেত। বিশেষ করে নাজিরপুর উপজেলার বিল অঞ্চলে এবং সরূপকাঠি উপজেলায়। নদীতে লবণাক্ত পানি বৃদ্ধির ফলে মিঠা পানির মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ জেলায় কিছু মাছ ছিল, যা মিঠা পানি এবং লবণ পানি উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেত যেমন তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, চাপিলা, ইলিশ ইত্যাদি। এসব মাছও দিন দিন কমে যাচ্ছে। বহু জাতের মাছ আছে, যা একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কুটির শিল্প : জেলায় বেশ কিছু কুটির শিল্প রয়েছে যেমন শীতলপাটি, মৃৎ শিল্প, পাপোষ, কাঠের তৈরি তৈজষপত্র, কামার, স্বর্ণকার। এরা বেশিরভাগই দিন দিন অর্থের অভাব এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পেশা পরিবর্তন করছে। বিশেষ করে সরকারি কোন রকম সাহায্য সহানুভূতি না থাকায় শ্রমিকরা হতাশ হয়ে পড়ছে।

ফলজ কৃষি : জেলায় বেশ কিছু ফলজ কৃষি চাষ হয় যেমন কলা, পেয়ারা, আমড়া, নারিকেল ও সুপারি। এ সকল সম্পদ ঠিকভাবে বাজারজাত না করা বা সংরক্ষণের অভাবে কৃষকরা হতাশ হচ্ছে। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকরা প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃত মূল্যের এক বিরাট অংশ এ ফরিয়া বা আড়তদাররা নিয়ে নেয়। এ ছাড়া পেয়ারা, আমড়া, কলা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ফলন কম হচ্ছে। এখানে কৃষকরা সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য কৃষকরা তাদের ফসলের বাজারজাত করতে পারে না। অন্য জেলা থেকে মালামাল আনাও সমস্যা।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন দরকার। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জে ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দরকার। এ ছাড়া নৌপথও নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব : দ্বীপাঞ্চল ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হলো উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে। সেই সাথে পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

Free soil test for farmers

পিরোজপুরে এসিড নিক্ষেপ মামলায় তিনজনের ফাঁসি

১ জনের যাবজ্জীবন, ২ আসামি বেকসুর খালাস

Tk 99.46 lakh land tax realised in Pirojpur

ইউরোপে সবজির বাজার পেতে পারে বাংলাদেশ

Judge sets a rare example

Files case, gives 10 days' RI for assaulting plaintiff in dowry case

70,962 hectares put under Aman farming in Pirojpur

সম্ভাবনা ও সুযোগ

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষির দিক থেকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় জেলা পিরোজপুর। জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জন-উদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হলো।

কৃষি উন্নয়ন

জেলার বেশির ভাগ পরিবারই কৃষিনির্ভর বা জেলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। তাই এ কৃষিকে উন্নত করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। কৃষিকে উন্নত করতে হলে কৃষকদের আধুনিক চাষ সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং সেই সাথে উন্নত ধানের বীজ সরবরাহ করা দরকার। সেই সাথে কৃষিজাতদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

সম্ভাবনা ও সুযোগ
কৃষি উন্নয়ন
- কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প
- নার্সারী
- চিংড়ি চাষ
- সমুদ্রের মাছ
- খাল-বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ব্যক্তিখাত
- শুঁটকি মাছ
- ব্যবসা বাণিজ্য
- শিল্পাঞ্চল
- পর্যটন শিল্প
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার
- মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার
- বনজ সম্পদ সংরক্ষণ

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প : এ জেলা কৃষি নির্ভর, এখানে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন নারিকেলের ছোবরা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক অনেক কিছু তৈরি হয়। তারপর কাঠ শিল্প, শীতলপাটি, মৃৎ শিল্প, কামার, এসবের বেশ সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও এ জেলায় বেশ কয়েকটি মৌসুমী ফল জন্মায়, যেমন পেয়ারা ও আমড়া। এ দুটি ফল টিনজাত করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করা যায়।

এ ছাড়াও রয়েছে শীতকালীন শাক-সবজি, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করা হয়। সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক ও দ্রুত ব্যবস্থা এ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে। বিশেষ করে মৌসুমী ফল, সবজি প্রক্রিয়াজাত করা অতীব জরুরী। সেই সাথে কৃষিকে প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশগত দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে হবে।

নার্সারী : জেলায় গাছের চারা উৎপাদনে বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগ ব্যাপক। সরকারি এবং বেসরকারি নার্সারীতে উৎপাদিত হরেক রকমের চারা স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছায়। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে প্রতি বছর যে পরিমাণ চারা দরকার তার ২০% শুধু পিরোজপুর জেলা থেকে সরবরাহ করা হয়। এ জেলায় অনেক মানুষ নার্সারীকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ জেলায় অনেক আগে থেকেই চারা উৎপাদন হয়ে আসছে। তাই এ নার্সারী শিল্পকে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি সাহায্য করে গঠনমূলকভাবে সহযোগিতা করে এবং বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং বাজারজাত করার সহজ পরিবহন ব্যবস্থা থাকে তাহলে নার্সারী শিল্প আরো বিকশিত হবে। এখানে উল্লেখ্য, নার্সারীতে অবদান রাখার জন্য এক যুবক জাতিসংঘ পুরস্কারও পেয়েছেন।

চিংড়ি চাষ : জেলায় ক্রমাগতভাবে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে গলদা এবং বাগদা মিলিয়ে চিংড়ির চাষ আরো ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেলায় চিংড়ি চাষের উপযুক্ত জমিগুলোতে নিবিড় ও পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ করা সম্ভব এবং এতে করে চিংড়ি চাষের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। জমির যথাযথ ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতাসহ ঘের এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর সাথে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চিংড়ি জাত খাবার তৈরি জেলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। কেননা এর

ফলে বর্তমানে প্রচলিত চিংড়ি চাষের এলাকায় অনেক বেশি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান হবে, ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

সমুদ্রের মাছ : যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে সমুদ্রের মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। জেলেদের উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ)'র ব্যবস্থা করে দিলে তারা গভীর সাগরে গিয়ে মাছ ধরতে উৎসাহিত হবে। এর ফলে অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে মাছ উৎপাদন বাড়বে। সেই সাথে সচেতনতা সৃষ্টিতে জেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাল-বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার : জেলায় প্রচুর খাল-বিল ও নালা রয়েছে। এ সকল খাল-বিল ও নালায় সব সময় জোয়ারের জন্য প্রতিনিয়ত পলি জমছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বন্যা ও জলোচ্ছ্বসের ফলে বেশি পলি জমে। এ পলির ফলে খাল-বিল ও নালাগুলোর সাথে নদীর সংযোগস্থল উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফসলী জমির পানি নদীতে নামতে পারে না এবং ফসল নষ্ট হয়। তাই খাল ও নালাগুলো সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ব্যক্তিখাত : জেলার ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা দরকার। জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তি খাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কয়েকটি লবণ ফ্যাক্টরি ও বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বছর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, পাপোষ, কার্পেট, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

শুঁটকি মাছ : জেলায় একটি বৃহৎ সমুদ্রিক মাছের মোকাম (পারের হাট) রয়েছে। এ মোকামের আশপাশে বা সমুদ্রের কাছাকাছি কিছু শুঁটকি তৈরি করা হয়। একইভাবে এ জেলার উত্তর সীমানায় কিছু কিছু মিঠা পানির ছোট মাছ শুঁটকি করা হয়। শুঁটকি করার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। উল্লেখ্য, এ জেলার বহু শ্রমিক (নারী-পুরুষ) মৌসুমের সময় সমুদ্রের তীরবর্তী দ্বীপে শুঁটকীর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায়। যথাযথ আর্থিক সাহায্য ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের (যেমন স্বল্প দামের সোলার টানেল ড্রয়ার পদ্ধতির) মাধ্যমে শুঁটকি শিল্পের প্রসার ঘটতে পারে।

ব্যবসা বাণিজ্য : জেলায় কৃষি বনজ ও ফলজ বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে। তাই জেলায় বেশ কিছু বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐ সকল কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, জেটি এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অতি সহজে দেশের বাজারে স্থানীয় পণ্য পৌছানো নিশ্চিত করতে পারলে এ জেলার বাণিজ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পাঞ্চল : জেলায় শিল্প তেমন গড়ে উঠেনি। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে অবকাঠামো পূর্বে তেমন ছিল না। এ জেলায় বেশ কিছু কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে স্বরূপকাঠী উপজেলায়। ৬০-এর দশকে ২৫ একর জমির উপর একটি বিসিক শিল্প নগরী গড়ে উঠে। এ ছাড়াও এ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কুটির শিল্প রয়েছে। যেমন পাপোষ, রশি, কাঠের বিভিন্ন জিনিষপত্র, খেলার সামগ্রী ছাড়াও জেলায় প্রচুর স-মিল রয়েছে। এ জেলায় বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল বাণিজ্য কেন্দ্রে উপকূলীয় এলাকার উৎপাদিত কৃষি সামগ্রী এবং কুটির শিল্প সামগ্রী পাইকারি বেচা-কেনা হয়। ধান-চাল, সুপারি, নারিকেল, কলা, পেয়ারা, পান, পাপোষ, রশি, কাঠের তৈরি ঘরের সামগ্রী ও শীতকালীন শাক-সবজি কেনা-বেচার প্রচুর আড়ত রয়েছে। এসব পণ্য ঢাকাসহ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় চালান হয়। জেলার জুজখোলায় একটি টেক্সটাইল মিল গড়ে উঠছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জেলার ভৌগলিক অবস্থান শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার বড় অন্তরায়।

পর্যটন শিল্প : এ জেলার অতি নিকটেই সুন্দরবন। এ সকল বিষয়ে প্রচার ঘটলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে এবং পর্যটনের অনেকটা প্রসার ঘটবে। বিশেষ করে জেলার দক্ষিণের অংশটা খুবই আকর্ষণীয়। এ জেলায় অবকাশ কেন্দ্র, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নৌ-ভ্রমণের সুযোগ করতে পারলে সুন্দরবন এবং মোহনায় একটি সুন্দর পর্যটন এলাকা গড়ে উঠতে পারে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : এ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ইদানীং জেলা শহরের সাথে ঢাকা বা অন্যান্য শহরের যোগাযোগ সহজ হয়েছে, কিন্তু গ্রাম, হাট-বাজারের সাথে যোগাযোগ অপ্রতুল। তাদের একমাত্র পথ নৌপথ। তাই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে অর্থনৈতিক দিক আরও সমৃদ্ধ হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গাছ-পালা যেমন নলবন, হোগলাবন, কেওরাবন এবং বিভিন্ন রকমের গাছ, যা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করলে জেলার ফসল বা গাছ-পালা ও নদী-নালা রক্ষা পাবে।

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ : মাছ আমাদের মূল্যবান সম্পদ। কালে কালে এ জেলায় নদী-নালা ও খাল-বিলের মাছ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। মোহনা ও জেলার নদীগুলোতে রাষ্ট্রীয় আইন না মেনে বিভিন্ন রকমের নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে নদীতে লোনা পানি ও মিঠা পানির মাছের পোনা নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে জলাশয় ও বিলগুলোতে রাষ্ট্রীয় আইন মানা হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় মৎস্য আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে এ জেলায় মৎস্য একটি সম্ভাবনাময় সম্পদ হিসেবে বিস্তার লাভ করতে পারে। এ ছাড়া এ জেলায় মিঠা পানিতে মাছ চাষের সুযোগ রয়েছে।

ভূমি ব্যবহার : পরিকল্পনা মাফিক জমি ব্যবহার করলে জমির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে জমির উর্বরতাও রক্ষা হয়।

বনজ সম্পদ সংরক্ষণ : জেলার সমুদ্র উপকূল বরাবর বন সৃষ্টি করা যেতে পারে। ম্যানগ্রোভ ছাড়াও নল, কেওড়া, হোগলা ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। এ বন একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জেলাকে রক্ষা করবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সুফল দেবে।

	২০১৫	২০৫০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	১১.৬২	১৪.২৪

দর্শনীয় স্থান

অসংখ্য নদী-নালা ও খাল-বিল দিয়ে ঘেরা পিরোজপুর। সমুদ্র, সুন্দরবন কোল ঘেঁষে যাওয়ায় এবং মানুষের হাতে সাজিয়ে তোলা বৃক্ষরাজি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক সবুজের সমারোহ এবং করে তুলেছে দর্শনীয়। এ জেলায় বিশেষ দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে পুরনো দিনের কিছু স্থান, যেমন-

রায়ের কাঠী জমিদার বাড়ি : পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত রায়েরকাঠী জমিদারবাড়ি। শতাব্দীর প্রথম দিকে জমিদার রুদ্রনারায়ন রায় ঝালকাঠীর লুৎফাবাদ ছেড়ে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। ১৬৫৮ সালে এখানে একটি কালী মন্দির তৈরি করা হয়। কালী মন্দিরকের ঘিরে গড়ে ওঠে বাজার, নদী বন্দর, দিঘী, নাট্যশালা, অতিথিশালা ইত্যাদি। প্রচলন করা হয় চৈত্র সংক্রান্তি মেলার। এরপর এখানে তৈরি করা হয় কষ্টিপাথরের বৃহদাকার শিব মন্দির। এ মন্দিরে এখনও হিন্দু সম্প্রদায় পূজা করে এবং বছরে একবার পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

শহীদ মিনার : পিরোজপুর শহরের সাথেই বলেশ্বর নদীর তীরস্থ শহীদ মিনার। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক হানাদার বাহিনী শত শত লোককে হত্যা করে এ স্থানে। এ ছাড়াও জেলার স্বরূপকাঠী উপজেলার মোহাগছর গ্রামে রয়েছে সাত ব্যক্তির কবর নামে একটি গণকবর। এখানে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক হানাদার বাহিনী বেশ কিছু লোককে হত্যা করে কবর দেয় যার মধ্যে একই পরিবার সাতজনকে একই দড়ি দিয়ে বেঁধে হত্যা করা হয়।

কুরিয়ানার পেয়ারা বাগান : স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিযোদ্ধারা দক্ষিণ বাংলার এই পেয়ারা বাগানে একত্রিত হত এবং এখান থেকেই পিরোজপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হত। বর্ষাকালে এখানে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয় ।

সাতুরিয়া মিয়াবাড়ি : শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের জন্মস্থান। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর কাউখালী উপজেলার চিড়াপাড়ার সাতুরিয়া গ্রামে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এখনও এ জমিদার বাড়ির দালানকোঠা রয়েছে।

রাধা পাগলের মেলা : কদম তলা রাধা পাগলের মেলা এক সময় খুবই বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে চৈত্র সংক্রান্তিতে এ মেলা ৫/৬ দিন ধরে চলে। এ মেলার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রাধানাথ মিস্ত্রী। তিনি এক সময় তার শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গান বাজনা করে বিধবা বিবাহ বৈধ বলে প্রচার করতেন এবং তার মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানাতেন। এর ফলে রক্ষণশীল প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তিদের চক্ষুশুলে পরিণত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে এ মেলায় বিধবারা নিজেরা আসতেন এবং বাবা-মা অল্প বয়সি বিধবা মেয়ে নিয়ে আসতেন। এ মেলায় বসে ৫/৬ দিন ধরে পুরুষ ও মহিলারা একে অন্যকে পছন্দ করে, মেলার শেষ দিনে হিন্দু ধর্মমতে মালা বদল করে এবং সাত পাকে ঘুরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। এখনো মেলায় নাম কীর্তন, শাস্ত্রীয় গান ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে পসরা সাজিয়ে রাখেন এবং ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসপত্র কিনে নেন।